Vol. 51 | No. 3 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী চেতনা

Volume	51
Issue	3
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ মাসুদ আলম
Published online	June 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i3.10
Pages	১৬৫-১৭৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫১, সংখ্যা : ৩ ॥ আষাঢ় ১৪২১ ॥ জুন ২০১৪

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী চেতনা

Check for updates

মোঃ মাসুদ আলম*

জগত ও জীবনের জ্ঞানার্জন ও সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে দর্শনের শাস্ত্রীয় কাঠামোর বাইরে সর্বাধিক আলোচিত, ব্যক্তিক স্বাধীনতা-মর্যাদা-অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোড়িত, মৌল জীবনবোধকে অবলম্বন করে ব্যক্তিসত্তাকেন্দ্রিক যে সমকালীন দার্শনিক আন্দোলন সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বে বহুল প্রচলিত তা হলো অস্তিত্ববাদ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাতে মানুষের বিপন্ন ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি মর্যাদা, ব্যক্তির দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধ রক্ষার তাগিদে, মানব সভ্যতার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করা পরপর দু'টি মহাযুদ্ধের পরই মানুষকে সকল প্রকার দুর্বলতা, নিরাপত্তাহীনতা ও সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে এবং জার্মান অধ্যাত্মবাদের চরম পরিণতি হেগেলীয় সার্বিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিশ শতকে 'অস্তিত্ববাদ' এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের রূপ লাভ করে। এ সময়ে এ নতুন চিন্তাধারা ও জ্ঞানবুদ্ধি বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি, ধর্মতত্ত্ববিদ, মনস্তত্ত্ববিদ ও দার্শনিকের বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ডেনমার্কের সোরেন কিয়ের্কেগ (১৮১৩-১৮৫৫), জার্মানির কার্ল জেসপার্স (১৮৮৩-১৯৬৯), মার্টিন হিডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬) ও মার্টিন বুবার (১৮৭৮-১৯৬৫), ফ্রান্সের জ্যাঁ পল সার্ত (১৯০৫-১৯৮০), আলবেয়ার কামু (১৯১৩-১৯৬০), জ্যাঁ ওয়াহ্‌ল (১৮৮৮-১৯৭৪), গ্যাব্রিয়েল মার্সেল (১৮৮৯-১৯৭৩) ও ফ্রাঞ্জ কাফ্‌কা (১৮৮৩-১৯২৪), স্পেনের জোসে ওর্তেগায় গ্যাসেট (১৮৮৩-১৯৫৫) ও মিগুয়েল ডি উনামুনো (১৮৬৪-১৯৩৬), রাশিয়ার ফিওদোর মিখাইলোভিচ দস্তয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১), নিকোলাই বারদায়েভ (১৮৭৪-১৯৪৮) ও লেভ শেস্টভ (১৮৬৬-১৯৩৮) প্রমুখ লেখক, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের প্রচেষ্টায় অস্তিত্ববাদ একটি সুসংবদ্ধ ব্যক্তিক জীবনবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাগতিক পরিবেশের নানা সংকট, দুঃখ-দুর্দশা-হতাশা, সমস্যা, সম্ভাবনা ও উৎকণ্ঠিত ব্যক্তিমানুষকে কেন্দ্র করেই অস্তিত্ববাদ বিকশিত হয়েছে। এর মূল আলোচ্য বিষয় হলো অস্তিত্বের বিশ্লেষণ এবং যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিমানুষ এ বস্তু জগতে তার নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায়।

> অস্তিত্ববাদ দার্শনিকীকরণের অন্যতম পন্থা, দার্শনিক মতবাদের সমষ্টি নয়। এই দার্শনিকীকরণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। অস্তিত্ববাদ কোন বস্তু বা বস্তুসামগ্রীর দর্শন নয়, এ হলো মনুষ্য-পরিস্থিতির দর্শন। এ দর্শন বিষয়ীর দর্শন, বিষয়ের দর্শন নয়। (সঞ্জীব, ১৯৮৬ : ১)

অস্তিত্ববাদ স্বাধীন ইচ্ছা, নির্বাচনমুখিতা ও ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সার্থকতা, ব্যক্তি জীবনের অর্থবহতা ও মূর্ত মানুষের বাস্তবতার ভিত্তি অনুসন্ধান করে। এ যেন প্রকৃত জীবনযাত্রার সাথে এক বোঝাপড়া, সরাসরি মোকাবিলা যেখানে ব্যক্তি

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল।

প্রতিনিয়ত তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে স্বাধীন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। অমূর্ত অবাস্তব অন্তঃসার ধারণা নয়, ব্যক্তিমানুষের সাথে জড়িত মূর্ত বাস্তব অস্তিত্বই এখানে আলোচনার প্রথম ও প্রধান বিষয়। মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মূলত "অস্তিত্ব অন্তঃসারের পূর্ববর্তী — এ যুক্তিতেই অস্তিত্ববাদীরা দার্শনিক আন্দোলনের মোড় অন্তঃসার থেকে ব্যক্তি সত্তায়, সার্বিক ধারণা থেকে বিশিষ্ট মূর্ত বস্তুতে এবং বুদ্ধিবাদ থেকে মানবতাবাদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন।" (আমিনুল, ১৯৯৯ : ২৪৩)। অস্তিত্ববাদ অনুসারে, ব্যক্তিমানুষের অর্থপূর্ণ জীবনের প্রত্যক্ষ চেতনাবোধ হিসেবে যেমন স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে, তেমনি রয়েছে স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে নিজস্ব প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষমতা। এক্ষেত্রে বিপুলা এ পৃথিবীর মূল্য ব্যক্তির নিকট ততটুকু যতটুকু সে জড়িয়ে রয়েছে। একজন ব্যক্তির সর্বোত্তম সময় হলো যখন সে নিজস্ব প্রকৃতি (individual nature)-র বিরুদ্ধে এবং জীবনের জন্য সংগ্রাম করে। তাই, ব্যক্তিক "মানব অস্তিত্বের আসল রহস্য বুদ্ধি বা চিন্তার মাধ্যমে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় বেঁচে থাকার বাস্তবতার মধ্যে। মনের স্বমুখীনতায় নিহিত আছে অস্তিত্বের আসল রহস্য" (সঞ্জীব ১৯৮৬ : ২)। সক্রিয় ও স্বাধীনভাবে সংকল্প, নির্বাচন ও কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়ে অর্থবহ জীবন যাপন করাই হলো অস্তিত্ববাদীদের নিকট অস্তিত্বের আসল তাৎপর্য। এখানে অস্তিত্বশীলতার অর্থই হলো স্বাধীন ও সক্রিয়ভাবে 'আমি কী হব' তা নির্বাচন করা। প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় এবং সে অনুসারে নিজেকে তৈরি করে।

রক্ত-মাংসে গড়া ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব, সংকট ও তার সমস্যাবলি অস্তিত্ববাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলেও কোনো কোনো অস্তিত্ববাদী দার্শনিক শেষ পর্যন্ত মানুষকে নিয়ে হাজির করেছেন ঈশ্বর বা পরম সত্তার সামনে। এ দলের দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন সোরেন কিয়ের্কেগ, কার্ল জেসপার্স, গ্যাব্রিয়েল মার্সেল প্রমুখ যাদের চিন্তাধারা আস্তিক অস্তিত্ববাদ হিসেবে চিহ্নিত। তবে, তাঁদের কারো মতবাদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার যুক্তি উপস্থাপনের কোনো প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। মূলত তাঁরা ব্যক্তির বাস্তব অস্তিত্বকে ঈশ্বরতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। আবার কোনো কোনো অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের নিকট ঈশ্বর মৃত; ব্যক্তিমানুষই সব। এ দলে রয়েছেন ফ্রেডরিক নিটশে (১৮৪৪-১৯০০), জ্যাঁ পল সার্ত, আলবেয়ার কামু প্রমুখ দার্শনিক। তাঁরা ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি; কেবল নাস্তিক্যবাদী ভাবধারা গ্রহণ করেছেন। আস্তিক্য দর্শনে মানুষের জীবনের ব্যাখ্যা একরূপ; নাস্তিক্য ধারায় মানুষের জীবন অন্য একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। মানুষ অন্য কোনো মহাশক্তিধর সত্তা দ্বারা সৃষ্ট নয়; পূর্বকল্পিত বা পূর্বনির্ধারিতও নয়। ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব তাই প্রথমে আসবে এবং আত্মবিনির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে নির্ধারিত হবে তার সারসত্তা।

এই নাস্তিক্য পরিমণ্ডলে যেমন কোনো বিধি নেই, তেমনি কোনো (বিধির) বিধানও নেই, পরকালে পুরস্কারের কোনো প্রতিশ্রুতি নেই, সেই অর্থে কোনো আশাও নেই। পূর্ব-নির্ধারিত কোনো নিশ্চয়তাও (determinism) নেই। আছে মানুষ নিজে, আছে বিধানবিহীন অবস্থায় স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ (freedom), আছে বিচিত্র সম্ভাবনা ও

বিকল্পের মাঝ থেকে স্ব-নির্বাচনের সুযোগ (choice) এবং আছে এ বিচিত্র পটভূমিতে আত্ম-নির্মাণের ভেতর দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উপনীত হবার সম্ভাবনা। (গালিব, ২০০১ : ১২৬)।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, "অস্তিত্ববাদীরা যে ধর্মবিশ্বাসেরই অন্তর্ভুক্ত হোন না কেন, তাতে কিন্তু অস্তিত্ববাদের মূল সুর, মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁদের অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয় না।" (নীরুকুমার, ১৯৯৭ : ০১)।

শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুধা বিভক্ত শাখায় বিচরণকারী অস্তিত্ববাদী জীবন চেতনায় পরিস্রুত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন মাধ্যমে অস্তিত্ববাদের ভাব-ভাবনা, পারিপার্শ্বিকতার সাথে দৈশিক ও কালিক প্রেক্ষাপটে মানুষের ব্যক্তিক সম্পর্ক ও তার দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেছেন। তাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অস্তিত্ববাদকে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়। বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে "অস্তিত্ববাদ হলো এমন একটি দার্শনিক আন্দোলন — যা ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে, সাধারণ অর্থে নয়, মূর্ত ও বাস্তব ধারণা হিসেবে; অর্থাৎ অস্তিত্ব যেভাবে বাস্তবে কোনো একটা বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রকাশিত হয়, সেভাবে।" (নীরুকুমার, ১৯৯৭ : ২)। তাত্ত্বিক দর্শনের দিক থেকে হিডেগার, হুসার্ল (১৮৫৯-১৯৩৮) হলেন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক। একবিংশ শতাব্দীর ধর্মতত্ত্বে রুডলফ বাটম্যান (১৮৮৪-১৯৭৬), পল তিলিক (১৮৮৬-১৯৬৫), কার্ল বার্থ (১৮৮৬-১৯৬৮) প্রমুখ এবং মনোবিজ্ঞানে লুডভিগ বিন্‌সওয়ানজার (১৮৫২-১৯২৯) ও মেদার্দ বস (১৯০৩-১৯৯০) থেকে অটো র‍্যাংক (১৮৮৪-১৯৩৯), আরডি লাইয়িং (১৯২৭-১৯৮৯) ও ভিক্টর ফ্রাংকেল (১৯০৫-১৯৯৭)-এর মাধ্যমে অস্তিত্ববাদের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব দেখা যায়। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদী চেতনা হলো মৌল জীবনবোধ। মৌল জীবনবোধ হিসেবে অস্তিত্ববাদী সাহিত্য ব্যক্তিক চেতনার ব্যাখ্যায় সমকালীন সমাজ, জীবন ও মানুষের ইতিবাচক দিক তুলে ধরে, ব্যক্তিমানুষকে জীবনের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল, দায়বদ্ধ, ক্রিয়াশীল ও জীবন্ত হতে শেখায়। কিয়ের্কেগ ও সার্ত হলেন দার্শনিক ও সাহিত্যিক। আলবেয়ার কামু, কাফ্‌কা, দস্তয়েভস্কি, সিমোন দ্য ব্যুভয়ার (১৯০৮-১৯৮৬), ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬), প্যারিসের জ্যাঁ জেনেট (১৯১০-১৯৮৬), এন্ড্রু গাইড (১৮৬৯-১৯৫১), এন্ড্রু ম্যালরক্স (১৯০১-১৯৭৬), স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬-১৯৮৯), নরওয়ের নুট হ্যামসান (১৮৫৯-১৯৫২), রোমানিয়ার ইউগেন আইওনেস্কো (১৯০৯-১৯৯৪), চিত্রশিল্পী আলবার্তো গিয়াকোমেত্তি (১৯০১-১৯৬৬), বিমূর্ত প্রকাশবাদী জ্যাকসন পোলক (১৯১২-১৯৫৬), আরশাইল গোর্কি (১৯০৪-১৯৪৮) ও উইলেম ডি কুনিং (১৯০৪-১৯৯৭) এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা জ্যাঁ লুক গোদার্দ (১৯৩০-) ও ইংমার বার্গম্যান (১৯১৮-২০০৭) সাহিত্য ও শিল্পে অস্তিত্ববাদের প্রয়োগ করেছেন তাঁদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে। তবে তাঁরা তাঁদের শিল্পে তাত্ত্বিক অস্তিত্ববাদকে তুলে ধরেন নি; বরং ব্যক্তির অস্তিত্বকে তুলে ধরেছেন বেঁচে থাকার তীব্রতম বাসনা, সংকট, সংগ্রাম ও দায়বদ্ধতার মাধ্যমে। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবু ইসহাক, শওকত ওসমান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক প্রমুখ সাহিত্যিকের লেখনীতে দেখা যায় ব্যক্তির একক

অস্তিত্বের অব্যাহত অনুরণন। এ অনুরণন প্রতিফলিত হয় অস্তিত্ব জয়ের উল্লাস, অস্তিত্ব রক্ষার সংকট ও সংগ্রাম, প্রেম, বিরহ, আমিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বা বেঁচে থাকার তীব্র বাসনার মাধ্যমে। কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসটি অস্তিত্ববাদী চেতনায় সমৃদ্ধ একটি শিল্পকর্ম। আমরা এখানে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে বর্ণিত অস্তিত্ববাদী চেতনার বুনন, প্রতিফলন ও প্রক্ষেপণ তুলে ধরার চেষ্টা করব। আবু ইসহাকের এ উপন্যাসটিতে সামাজিক ও ব্যক্তিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির প্রগাঢ় অনুভূতির এক অনবদ্য ছবি, জীবনের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, ভালোবাসার কথা, উত্তরণের কথা এবং মানবজীবনের গভীর প্রত্যাশার কথা বলেছেন। আমরা এখানে অস্তিত্ববাদী জীবনবোধের কয়েকটি লক্ষণ, যেমন— জীবন-পদ্ধতি, উৎকণ্ঠা ও অকৃত্রিমতা, স্বাধীনতা, জীবন-পরিস্থিতি, অস্তিত্ব, আত্ম-উত্তরণ, ভয় ও মনস্তাপ, হতাশা, বিচ্ছিন্নতা বা চ্যুতি, একাকিত্ব, মৃত্যুবোধ প্রভৃতি বিবেচনায় নিয়ে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসটিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাব।

অস্তিত্ববাদী চেতনার প্রারম্ভ বিন্দু হলো অস্তিত্বশীল ব্যক্তি-মানব সত্তা। এই অস্তিত্বশীল ব্যক্তি মানব সত্তা বস্তুগত প্রকৃতি (objective nature) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কারণ সে হলো কর্তা। তবে এ কর্তা কোনো সার্বিক, বিমূর্ত বা ধারণাগত কর্তা নয়, বরং এ কর্তা হলো আত্মসচেতন ক্রিয়াশীল কর্তা। এ কর্তা চিন্তাশীল নৈর্ব্যক্তিক নয়, সে নিজে ক্রিয়া করে এবং প্রতিনিয়ত বাস্তব সমস্যাসংকুল পথে তার এগিয়ে চলা। এ এগিয়ে চলায় ব্যক্তির জীবনে রয়েছে আবেগ, উৎকণ্ঠা, ত্রাস, শূন্যতা, নিঃসঙ্গতা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে জীবনের প্রতি এক গভীর আশাবাদ। *সূর্য দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে রয়েছে জীবনের প্রতি আশাবাদের এক সাবলীল বয়ান। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জয়গুন তার জীবনের ভালোমন্দ নিজ হাতে গড়ার চেষ্টায় ব্যাপৃত। স্বাধীন নির্বাচন ও কর্ম প্রেরণার মাধ্যমে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টায় রত। তবে এ সুযোগ তাকে কেউ সৃষ্টি করে দেয়নি, সে নিজেই তৈরি করে নিয়েছে। তার এ চেতনা ব্যক্তিক জীবনের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। উপন্যাসের শুরুতেই রয়েছে জীবনের প্রতি এক প্রগাঢ় আশাবাদ ১৯৮৬ :

> তারা আবার গ্রামে ফিরে আসে। ... অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। ... যারা ফিরে আসে তারা বুকভরা আশা নিয়ে আসে বাঁচবার। ...পঞ্চাশের মন্বন্তরে হুঁচোট খাওয়া দেশ আবার টলতে টলতে দাঁড়ায় লাঠি ভর দিয়ে। ... দু'টি ছেলে-মেয়ের হাত ধরে জয়গুণ গ্রামে ফিরে আসে। (ইসহাক, ১৯৯৯ : ০৭)

সমাজ-সংকট পীড়িত হয়ে, দুঃসহ জীবনবাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংঘাতময় সমাজ জীবনের ছকে ও বৈরী প্রতিবেশে জয়গুনের বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা ও প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে এক আশাবাদী জীবনবোধ পরিস্ফুট। এমনকি করিম বক্সের ঔরসজাত শিশুপুত্র কাসু ডবল নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায় হলেও "অন্ধকারের মধ্যে জয়গুন আলো খুঁজে বেড়ায়। নিরাশার মধ্যেও আশা চেপে ধরে বুকে। ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও সে হাল ছেড়ে দেয় না।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ৮২)। "সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে রাত্রির জন্য প্রস্তুত হয়" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ৮৮) এবং শফির মা'র কথা "তার নিরাশ মনে আশা জাগিয়ে তোলে"

(ইসহাক, ১৯৯৯ : ৮৮)। বিপুলা এই পৃথিবীতে দাঁড়ানোর মতো শেষ মাটিটুকু ছেড়ে যাওয়ার সময়ও জয়গুনের পরিবার আত্মপ্রত্যয়ী ও আশাবাদী। শফির মার উক্তি, "খোদার এতবড় দুইন্যায় কি আর এট্টু জা'গা পাইতাম না আমরা?" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ১০০) কিংবা "মনে তাদের ভরসা খোদা বিশাল দুনিয়ায় মাথা গুজবার একটু ঠাঁই তারা পাবেই।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ১০০)।

পুরুষ-শাসিত সমাজের ব্যক্তি-স্বার্থকেন্দ্রিক কতিপয় হৃদয়হীন ব্যক্তির নিষ্ঠুরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্মমতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জয়গুন তার মনোবল হারায়নি এবং জীবনের প্রতি তার আশাবাদ পরিত্যাগ করেনি। "লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। তাঁকে বাঁচতে হবে, ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে হবে—এই সংকল্প নিয়ে আকালের সাথে পাঁচ বছর সে লড়াই করে আসছে।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ১৮)। নিষ্ঠুর পীড়নের পরও অত্যাচারী শ্বাশুড়ি যখন বাড়ি থেকে মায়মুনকে তাড়িয়ে দেয় তখন মায়মুন দিক্‌ভ্রান্ত, হতাশাগ্রস্ত, হতবিহ্বল না হয়ে বিষয়টিকে এভাবে মেনে নেয়, "যেন কারাগার থেকে খালাস পেয়ে এল। তার আনন্দই হয়। আর সে আনন্দ বেড়ে যায় প্রত্যেক পদক্ষেপে। পেছনে তাকাতেও তার ভয় হয়।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ৮১)।

হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থান-সম্প্রীতির মর্মমূলে বিভাজন বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটায় সাতচল্লিশের দেশভাগ। নিরাপত্তা ও স্বস্তির অন্বেষণে স্বদেশ ত্যাগ স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। '৪৭-এর দেশ-বিভাগ ও স্বাধীনতা অর্জনের পর বাস্তুত্যাগের হিড়িক এবং রমেশ ডাক্তারের স্ত্রীর চোখে লাগা আলোর ধাঁধা ডাক্তারের পাকা চোখে নেশা জাগাতে পারে না, পারে না মায়া সৃষ্টি করতে। এমনকি ডাক্তারের স্ত্রীর কচুকাটা হওয়ার ভয়েও ডাক্তার থাকেন অবিচল এবং প্রচণ্ড আশাবাদী — "আবার এরা ফিরে আসবে। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, ক্ষুধা ও রোগে আধ-মরা হয়ে আবার এরা ফিরবে।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ৮৭)। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে 'স্বাধীনতা' কোনো রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক চেতনা বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নয়, এসেছে সাধারণ-খেটে খাওয়া-জীবন সংগ্রামে যুদ্ধরত প্রান্তিক ব্যক্তিমানুষের আশা ও আশাহত হওয়ার সূত্র ধরে। "স্বাধীনতার মাঝে তারা কোন মহৎ আবেগ নয় — 'চাল সস্তা হবে'; 'কারো কোন কষ্ট থাকবে না' এই আশাবাদ খুঁজে পায়। ভাত-কাপড় সুলভ হলে সহজতর দিন-যাপনের আশায় তারা উজ্জীবিত হয়; নতুন দেশের পতাকা উড়িয়ে জয়ধ্বনি দেয়।" (হোসনে আরা, ২০১১ : ৫৬)। "সবুজ নিশান নতুন জীবনের আভাস দিয়ে পায়। মনে জাগে বাঁচবার আশা।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ২৮)।

আবু ইসহাক তাঁর *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের জয়গুন চরিত্রের মাধ্যমে অস্তিত্বের সংকট ও সংকট উত্তরণের সুনিপুণ ছবি অঙ্কন করেছেন। সংকট উত্তরণের ক্ষেত্রে জয়গুন আত্মপ্রত্যয়ী। এক্ষেত্রে সে আত্মনির্মাণের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রত্যয়ী ও দায়িত্বশীল (responsible) হিসেবে নিজকে গড়ে তোলে। তার এ অবস্থাকে অস্তিত্ববাদের ভাষায় বলা যায় 'উদ্দামতার অবস্থা' যাকে সার্ত বলেছেন the state of abandonment (Sartre, 1970 : 32-39)। উদ্দামতার এ অবস্থায় একজন মানুষ তার কর্মপন্থা ও দায়িত্ববোধ ও

দায়বদ্ধতা থেকে স্বভাবতই উদ্বেগ বোধ করবে এবং এ থেকেই আসতে পারে তার হতাশা (despair) যন্ত্রণা ও মনস্তাপ (anguish)। সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী চেতনা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে লক্ষণগুলো বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন।

জয়গুন প্রতিনিয়ত যে প্রতিবেশে সংকটের মুখোমুখি হয় সেখানে তার অবস্থান একটি অবাঞ্ছিত আগন্তুকের ন্যায়। এটা তার জন্য পূর্ব নির্ধারিত নয়, আবার তার স্থিরীকৃত লক্ষ্যও নয়। সে এই পরিস্থিতিতে নিপতিত। জীবনের শুরুতে জয়গুন ছিল অজপাড়াগাঁর সরল-অবলা ও পরহেজগার পর্দানশীন নারী। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর করিম বক্‌শের সংসারে তার ছয় বছর কেটেছে অমানবিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনায়। "দুর্ভিক্ষের বছর বিনা দোষে সে (করিম বক্‌শ) জয়গুনকে তালাক দেয়।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ১৭)। দুর্ভিক্ষের নিদারুণ তাড়নায় বাস্তুত্যাগী শহরমুখী মানব স্রোতের সাথে জয়গুন মিশে গিয়েছিল দু'মুঠো ভাতের আশায়। কিন্তু শহরের জাঁকজমক, ঐশ্বর্যের জলুস চোখ ধাঁধালেও পেট ভরায় না। সে গ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হয় এবং শুরু হয় অপয়া ও অমঙ্গলের আঁধার সূর্যদীঘল বাড়িতে বসতি স্থাপনের প্রাণপণ চেষ্টা। তারপর একে একে জোবেদ আলী ফকিরের লালসার শিকার হওয়া এবং তাকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া, ভোগপ্রবৃত্তিকামী গ্রাম্য মাতব্বর গদু প্রধানের বিয়ের প্রস্তাব এবং তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান, তার পুত্র কাসুর অসুখ ও কাসুর সেবায় করিম বক্‌শের ঘরে যাওয়া এবং তাকিয়ে তাকিয়ে নেশা ধরে যাওয়া করিম বক্‌শের তাকে ঘরে ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব ও দৃঢ়ভাবে করিম বক্‌শকে না বলে দেয়া, উপন্যাসের শেষ প্রান্তে করিম বক্‌শের মৃত্যু, তার মেয়ে মায়মুনের বিয়ে ও তালাকপ্রাপ্তি, বাড়ি বাড়ি ঘর লেপা, ধান ভানা, চিড়া কোটা এবং উত্তর থেকে সস্তায় চাল কিনে এনে তা অল্প লাভে স্বল্প দামে বিক্রি করা, পুত্র হাসুর স্টেশনে কুলিগিরি করা ইত্যাদি নানা ঘটনা পরম্পরার সাথে জয়গুন সম্পৃক্ত হতে বাধ্য হয়। এরকম পরিস্থিতিতে মানুষ কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই জয়গুনের ব্যক্তিক অস্তিত্বও অসম্পূর্ণ। তবুও সে এই ঘটনামালার মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে চায়, প্রতিটি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ করতে চায়। অস্তিত্ববাদীরা এ অবস্থাকে বলেছেন মানব অস্তিত্বের আত্ম-অতিক্রমণ (bounding leap)।

জয়গুন যে প্রতিবেশে সংগ্রামরত এবং প্রাণ টেনে নিয়ে চলে তা তার অস্তিত্বের একটি অংশ। তার সামনে উপস্থিত প্রতিবেশটা শুধুই একটি কর্ম পরিবেশ নয়, তার অস্তিত্বেরই একটা দিক। জয়গুণের কর্ম-প্রচেষ্টা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আত্ম-অতিক্রমণ সব সময়েই অন্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এখানে প্রতিবেশের অস্তিত্ব ও তার অস্তিত্বের বাইরে অন্য চরিত্রগুলোর উপস্থিতি জয়গুনের অস্তিত্বেরই একটা অপরিহার্য অংশ। অস্তিত্ববাদের ভাষায় প্রতিবেশের সাথে ব্যক্তিক অস্তিত্বের সম্পর্ক হলো অস্তিত্বের জাগতিকতা (being in the world) এবং অন্যান্য ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক হলো অস্তিত্বের সম্পৃক্ততা (being with other)।

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসে ঘটনা পারম্পর্য জয়গুনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও বিভিন্ন বিচিত্র সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে প্রতি মুহূর্তে সে নিজকে রূপায়িত করে বয়ে চলেছে তার প্রবাহ। কিন্তু এ দায়িত্ব তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ও ব্যক্তিগত। এখানে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, একা।

কোন্ উদ্দীপকের প্রতি সে কেমন সাড়া দেবে, কোন্ ঘটনায় সে কোন্ প্রতিক্রিয়া দেখাবে, কার সাথে তার কী সম্পর্ক হবে, কোন্ পরিস্থিতিতে তার আচরণ কেমন হবে — এ সবই নির্ভর করে তার নিজের উপর। এ দায়িত্ব তার সম্পূর্ণ একার। অস্তিত্ববাদ অনুসারে, এই গুরুদায়িত্বের সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি যখন তার নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব উপলব্ধি করতে পারে তখন তার মধ্যে দেখা দেয় এক শঙ্কা (dread)। এই শঙ্কা ব্যক্তির জীবনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই শঙ্কার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি নিজেকে চিনতে শেখে, আত্মপরিচয় খুঁজে পায়। *সূর্য দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে জয়গুনকে এরকম শঙ্কার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, তাকে আমরা দেখি নিঃসঙ্গ, একা; তবে আত্মকেন্দ্রিক নয়।

জয়গুনের সম্পূর্ণ ব্যক্তিক অস্তিত্বই এক কর্মমুখর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ দ্বারা তাড়িত। এ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যেই জয়গুন তার উদ্দেশ্যহীন অস্তিত্ব থেকে উত্তরণ লাভ করে এবং প্রামাণিক অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উদ্বেগের সাথে ভয়ের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ভয় সাধারণত দেখা দেয় ভীতি উদ্রেককারী কোনো বিশেষ বস্তুকে অবলম্বন করে এবং এর উৎসমূল নিয়ে সবসময়ই একটা সুনির্দিষ্টতা থাকে। যেমন সাপের ভয়, আগুনের ভয়, ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় ইত্যাদি। কিন্তু "উদ্বেগের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। উদ্বেগ মানে একটি অনির্দিষ্ট অনুভূতি, এমন অনুভূতি যা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুসম্পর্কিত নয়। জগতের কোন কিছু নয়, বরং জগতে থাকার ব্যাপারটিই মানুষের মনে উদ্বেগ ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে।" (আমিনুল, ১৯৯৯ : ২৫০)। এ উদ্বেগ ব্যক্তিমানুষকে মানবিক আবেগের গভীরতম পর্যায়ে নিয়ে যায়। *সূর্য দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে আমরা এরকম আবেগ-উৎসারিত হতে দেখি জয়গুনের মধ্যে। হাসু ধড়িবাজ, কঞ্জুস রশীদ সাহেবের পাল্লায় পড়ে রাতে বাড়িতে ফিরে না আসলে "মায়ের মন ক্ষুধাতুর সন্তানের জন্য ব্যথিত হয়। তার চোখও শুকনো থাকে না।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ৪৮)। "করিম বক্শের কঠোর শাসনের বেড়াজালে বন্দী কাসুকে দেখার জন্য তার উৎকণ্ঠা সুগভীর আকুলতায় আচ্ছন্ন।"[২৩] (শিরীণ, ২০০৪ : ২০১)। কাসুর অসুখ, 'যহন-তহন অবস্থা' ও 'বে-হাল অবস্থার' কথা শুনে জয়গুণের যেন পায়ের নিচের মাটি সরে যায় এবং দুনিয়াটা অন্ধকার ঠেকে তার চোখে। "হৃদয়ভেদী কান্নার বেগ চেপে রাখতে গিয়ে তার স্বর ভেঙ্গে যায়।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ৮২)। "কানের কাছে কাসুর বুকে কফের ঘ্যাড়-ঘ্যাড় শব্দ এবং তার অনিয়মিত হ্রস্ব দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস জয়গুণের আশঙ্কাঘন মনে উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়। ঘন কালো অন্ধকার যেন চারদিক থেকে গিলে ধরবার জন্য হা করে আছে।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ৮৯)। অপরপক্ষে, 'পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ।/কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ।' —সমাজের এ নীতি-নির্দেশে তিন বছরের পুত্র কাসুকে তার নিজের কাছে রেখে দিলেও করিম বক্শের প্রতিটি মুহূর্ত কাটে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায়। কাসু যাতে কোনভাবেই তার মা জয়গুনের কাছে যেতে না পারে সে জন্য করিম বক্শ নিশ্ছিদ্র সাবধানতা অবলম্বন করে, কাসুকে ভয় দেখায়, নির্বিচার পীড়ন করে।

সদা উৎকণ্ঠিত, উদ্বেগ-তাড়িত জয়গুনের পুরো জীবনটিই যেন একটি সংগ্রাম। এ সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য জয়গুনকে করতে হয় নিরলস প্রচেষ্টা, নির্বাচন করতে হয় সঠিক কর্মপন্থা এবং থাকতে হয় সদা সচেতন ও সদাপ্রস্তুত। আত্মসচেতনতার কারণেই

নানাবিধ বাধা বিপত্তির ভেতর দিয়ে চলমান জয়গুনের কর্মময় জীবন। দুঃখময় বিপদসংকুল জীবনে সে সক্রিয়, সচেতনভাবে আত্মবিশ্বাসী। তার এ আত্মসচেতনতা-আত্মস্বাতন্ত্র্য তার মধ্যে জন্ম দেয় আত্ম-সম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদার। এ আত্মমর্যাদার জন্যই জয়গুণ ভোগপ্রবৃত্তিকামী জোবেদ আলী ফকির কিংবা বিকৃত কামনা চরিতার্থ করতে চাওয়া গ্রাম্য মাতুব্বর গদু প্রধানের অসংগত আকাঙ্ক্ষার অসংকোচ প্রতিবাদ করতে পেরেছে অকুণ্ঠচিত্তে। এমনকি তার পুর্বতন স্বামী করিম বক্‌শ তাঁকে পুনরায় বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে দেখা যায় জয়গুনের অন্তর্জীবনের বিক্ষোভের প্রতিফলন — "যে থুক একবার মাডিতে ফালাইছি, তা মোখ দিয়া চাটতে পারতাম না।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ৯৩)।

জয়গুন তার কর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। অস্তিত্ববাদীরা ব্যক্তির এ স্বাধীনতা নিয়ে নিয়তই উচ্চকণ্ঠ। স্বাধীনতাই হলো অস্তিত্ববাদের পরিচালক। স্বাধীন ইচ্ছার কারণেই জয়গুন তার নিজস্ব কর্মপন্থা নির্বাচন করতে পারে। স্বাধীন-চেতনা আছে বলেই সে বিবিধ বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও অভীষ্ট সিদ্ধিলাভের পথে এগিয়ে যায়। নানাবিধ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও সে তার নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা, মানব-অস্তিত্ব বিপন্ন হতে দেয় না। একটি ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ কাঠামোর লোলুপতায় ভরা কতিপয় তীক্ষ্ণ চোখ তার স্বাধীন সত্তাকে নিঃসম্বল ও পরনির্ভর করতে চাইলেও স্বাধীনতার চেতনায় সে অটল, তার কর্মপ্রবাহ থাকে সচল। `Freedom is the human reality' (নুরনবী, ২০০৬ : ১২২) কিংবা `to be human is to be free' (প্রাগুক্ত)—সার্তের এ বাণীই যেন জয়গুনের ক্ষেত্রে পরম সত্য। এ স্বাধীনতাই তার সকল কাজের কারণ, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের ভিত্তি। তবে তার এ স্বাধীনতা দায়িত্বহীন নয়; বরং দায়িত্বশীল ও অঙ্গীকারাবদ্ধ। অর্থাৎ জয়গুণের স্বাধীনতার সাথে তার দায়িত্ববোধ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এ কারণেই সে একাগ্রতা ও সাহসিকতার সাথে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে পারে এবং সুষ্ঠুভাবে কর্মপন্থা নির্বাচন করতে পারে। গ্রাম্য মসজিদের ইমাম তার পাঠানো ডিম গ্রহণ না করলে এবং হাসু লোকোপবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে জয়গুন দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করে, "ঘরে আইন্যা কে মোখের উপর তুইল্যা দিব?" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ১৭)। কিংবা শোনা যায় তার কঠিন কণ্ঠস্বর, "খাইট্টা খাইমু। কেওরডা চুরি কইর‍্যাও খাই না, খ'রাত কইর‍্যাও খাই না। কউক না, যার মনে যা।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ১৭)। নিজের মেয়ের বিয়ের জন্য তওবা করে কিছুদিন নিষ্ক্রিয় থাকলেও উদরের আগুন নিবাতে কাজে বেরিয়ে পড়ে এবং "ঘুম থেকে জয়গুন ওঠে নতুন প্রাণ, নতুন উদ্যম নিয়ে।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ৯৮)।

জয়গুনের স্বাধীন চেতনা, নির্বাচনমুখিতা ও জীবনসক্রিয়তা সত্ত্বেও তাকে বারবার অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। ফলে ঘটনা পারম্পর্যের স্বাভাবিক গতিতেই তার মধ্যে কখনও কখনও হতাশা ও মনস্তাপ দেখা দেয়। "জীবন সম্পর্কে অস্তিত্ববাদীগণ যে অনিশ্চয়তার কথা বলেন, জীবন পূর্ব-নির্ধারিত নয় বলে তাঁরা যে দাবী করেন এবং অবশেষে মনস্তাপ ও হতাশার যে বোধের কথা তাঁরা বলেন" (গালিব, ২০০১ : ১২৮) — এ সবই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে। জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত-শ্রান্ত জয়গুনের কণ্ঠে ফুটে ওঠে হতাশার সুর— "অনেক দ্যাখলাম, অনেক শিখলাম, আর না। পোলা মাইয়ার চোখ চাইয়া আর পারুম না, মাপ করো। পোলা আর মাইয়াডার

বিয়া দেইখ্যা যেন চোখ বুজতে পারি, দোয়া কইর‍্যো।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ৪১)। খোদায় খাওয়াইব — একথা শোনার পর জয়গুণের শেষের হাসি, মায়মুন শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার প্রাক্কালে জয়গুনের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পানি পড়া, "তখন কি আম্মুকি করছি ঘরের লক্ষ্মী ছাইড়্যা দিয়া" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ৯০) — করিম বক্শের এ রকম অনুশোচনা, করিম বক্শ মারা যাওয়ার পর জয়গুনের অনুভূতির করুণ সুর — "আহা বেচারা! জীবনে কাউকে ভালোবাসেনি। কারো ভালোবাসা পায়ও নি সে।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ১০০) প্রভৃতি জীবনের যুক্তি-তর্কের বাঁধভাঙা নগ্ন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত মনস্তাপ ও হতাশার বোধ।

মানুষের অতীত তার ব্যক্তিক অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও অতীত আমাদের ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করে না, তবুও কর্মমুখর জীবনে অতীতকে অস্বীকার করা যায় না। সময়ের সমান্তরালে জীবন সম্মুখপানে চলমান হলেও অতীত স্মৃতি মানুষের অন্তরলোক ও মানসলোকে যে স্বতঃস্ফূর্ত অনুরণন ঘটায় তা বাস্তব ও জীবনের সাথে সম্পর্কিত। কঠোর-কঠিন বাস্তব জীবনেও নস্টালজিক আবেদনকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিমানুষ হিসেবে জয়গুনের মনের ভেতরেও অতীত-অনুভূতিগুলো, রেখে আসা সময়গুলো বারবার হানা দেয়। তার মনে পড়ে বিগত জীবনের অনেক কাহিনি, দুর্ভিক্ষের কথা, দুধের শিশু মারা যাওয়ার কথা, করিম বক্শ কর্তৃক তাকে তাড়িয়ে দেয়ার কথা।

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসে জয়গুন চরিত্রই কেবল অস্তিত্ববাদী চেতনা ধারণ করেনি, অন্য চরিত্রগুলোও অস্তিত্বের চেতনায় এবং নিজ নিজ ভূমিকায় বিশিষ্ট, একক ও অনন্য। প্রত্যেকটি চরিত্রই দৃঢ়চেতা, আত্মসন্ধানী ও আত্মসচেতন। দুঃখী শফির মা, জয়গুনের সাথী লালুর মা, গেদীর মা, রাজার মা চরিত্রগুলো আর্থিক সংকটের মধ্যে সংগ্রামী, জীবনের ইতিবাচক পথে চলমান। হাসু তেরো বছর বয়সেই জীবনের বোঝা কাঁধে তুলে নেয়। "মা ও বোনের প্রতি আশ্চর্য দায়িত্বময় মমতা তার।" (শিরীণ, ২০০৪ : ২০৭)। ছোট ভাই কাসুর প্রতি দায়িত্ব পালনে সে কুণ্ঠাবোধ করে না। এ উপন্যাসের ছোট ও কিশোর চরিত্রগুলোর কাছে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা এতটাই প্রকট যে, রমজান হাতে তুড়ি দিয়ে বলে "পয়সা পাইলে মেথর-গিরিও করতে পারি। চাই পয়সা।" (ইসহাক, ১৯৯৯ : ৪৫)। এ উপন্যাসের খল চরিত্র গদু পরধান ধুরন্ধর, লোলুপ প্রবৃত্তিপরায়ণ ও ঠগ্ হলেও নিজের ব্যাপারে ষোলআনা সচেতন। মূলত *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসটি একটি অস্তিত্ববাদী চেতনায় ভাস্বর কাহিনি-চিত্র।

"সাহিত্য জীবনের কথা বলে, মানুষের কথা বলে।" (সঞ্জীব, ১৯৮৬ : ১৮৬) । তবে এ মানুষ বিমূর্ত, অবাস্তব ও ধারণাগত সার্বিক মানুষ না হয়ে যদি হয় জৈব-মনস্তাত্ত্বিক (psycho-physical) চেতনাসমৃদ্ধ রক্ত-মাংসের মূর্ত, বাস্তব সক্রিয় ব্যক্তিমানুষ তাহলে সে সাহিত্য হয় অতি বেশি মানবিক। আর "মানব অস্তিত্বের অপরিহার্য অঙ্গ — জীবন ও জগতের অসঙ্গতি, অস্থায়িত্ব, অনিশ্চয়তা, বেদনা, নৈরাশ্য, অবসাদ, মনস্তাপ, শংকা, আত্মবিচ্যুতি বা বিচ্ছিন্নতা ও মৃত্যু চিন্তা" (হারুন, ১৯৯৪ : ৯১-২) ইত্যাদি ব্যক্তির সব

মানসিক সংকট তথা শূন্যতা মুক্তির সংকল্প-দৃপ্ত চেতনা ও ব্যক্তিক স্বাধীনতা নিয়ে যে তাত্ত্বিক আলোচনা তাই অস্তিত্ববাদ। তাহলে, যেসব সাহিত্যকর্ম অস্তিত্ববাদী ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত, অস্তিত্ববাদের মৌল চেতনায় সমৃদ্ধ তাই হলো অস্তিত্ববাদী সাহিত্য। বিশ্ব সাহিত্যে যেমন অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রভাব লক্ষ করা যায় তেমনি "বাংলা সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্যসমূহ খুঁজে পাওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।" (শহীদুর, ১৯৯৮ : ০১)। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন "চর্যাপদে যেমন ব্যক্তির সত্তা-আমিত্বের ক্রমবিকশিত অনুরণন বিদ্যমান" (শহীদুর, ১৯৯৮ : ০২) তেমনি *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* "ব্যক্তি মানসের ইচ্ছার অবাধ-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।" (শহীদুর, ১৯৯৮ : ০৩) "ব্যক্তির অস্তিত্বের উপলব্ধি মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্যসমূহেও লক্ষণীয়।" (শহীদুর, ১৯৯৮ : ০৫) "এভাবে বাংলা সাহিত্যে অস্তিত্ববাদ পুষ্ট হয়ে আধুনিক কালে এসে যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, জীবনানন্দ কিংবা সুকান্ত অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য কর্মে তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হয়।" (শহীদুর, ১৯৯৮ : ০৭)। সমকালে আমরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শহীদুল্লা কায়সার, শওকত ওসমান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক প্রমুখ সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মে অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রভাব দেখতে পাই। অর্থাৎ আবু ইসহাকের কথাসাহিত্যে অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাব আকস্মিক কিংবা অপ্রত্যাশিত নয়। বাংলা সাহিত্যের পর্যায়ক্রমিক ক্রমবিকাশের ধারায়ই তাঁর সাহিত্যে এসেছে অস্তিত্ববাদী চেতনা। "গ্রামীণ জীবন ও জীবন অন্তর্গত সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব অন্বেষার স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে। গ্রামীণ মানুষের জীবনবোধ, জীবনাচরণ ও যাপিত জীবনকে তিনি নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন।" (মনির, ২০০৫-০৬ : ১৪৯)। "আবু ইসহাকের *পদ্মার পলিদ্বীপ* আখ্যানটি ফজল-রূপজান-জরিনার ব্যক্তিক সংকটকে উপজীব্য করেই গড়ে উঠেছে।" (মাযহার, ২০০৯ : ৭৩)। অর্থাৎ তাঁর এ উপন্যাসটিও অস্তিত্ববাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে বিষাক্ত ধোঁয়া উপমহাদেশীয় আকাশকে আচ্ছন্ন করেছে তার ছোঁয়া আমাদের ব্যক্তি-সত্তাকে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এর প্রভাব আমাদের সাহিত্য ও শিল্পে থাকাটাই স্বাভাবিক। আবার পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি দ্বারা আবু ইসহাক প্রভাবিত ছিলেন না — একথাও বলা যায় না। কারণ, তাঁর সমকালে বিদেশ থেকে এদেশে আধুনিক গ্রন্থাদির আগমন, পঠন-পাঠন ও অনুবাদ বিশেষ প্রসার লাভ করে। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, তিনি *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী দর্শনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত কিছু বিশেষ শব্দ সাবলীলভাবে ব্যবহার করেছেন।

"মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার কেন্দ্রমূলে অনুভূত অস্তিত্বের মৌল আয়োজনই উপন্যাসের বিষয়।" (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ৫৫)। এদিক থেকে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে "বহমান সময়ের পট-পরিসরে বাংলাদেশের বৃহত্তর গ্রামীণ জীবন ও সেই জীবন-অন্তর্গত মানুষের অস্তিত্ব অন্বেষার ভয়াল রূপ চিত্রিত করেছেন আবু ইসহাক।" (রফিকউল্লাহ, ২০০৯ : ৭০)। "অস্তিত্বের প্রশ্নে সংগ্রামশীল মানুষের জীবনবাস্তবতা, স্থানকালের ঐক্য, সংঘাতময় সমাজজীবনের ছকে জয়গুনের অস্তিত্বরূপ উন্মোচনের প্রচেষ্টা, সূচনা ও পরিণামের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন এ উপন্যাসটির শিল্পরীতিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।"(রফিকউল্লাহ, ২০০৯

: ৮৩)। আবু ইসহাকের *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তির দুঃখ, হতাশা, দায়িত্ববোধ, স্বাধীনতা, মর্যাদাবোধ, আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক ইত্যাদি একান্ত মানবীয় বিষয়সমূহ। প্রতিকূলতাকে জয়ের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধির যে পথে জয়গুন ও অন্যান্য চরিত্রের পথচলা তার মধ্য দিয়ে মানবিকতাবোধ উৎসারিত। এ উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসের মধ্য দিয়ে আবু ইসহাক মানবপ্রেম সম্পর্কিত চণ্ডীদাসের এক সুপ্রাচীন বাণীকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন — 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

আবু ইসহাক, ১৯৯৯ (ষোড়শ মুদ্রণ); *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা। (বর্তমান প্রবন্ধের সকল উদ্ধৃতির জন্য গ্রন্থের এ সংস্করণ দ্রষ্টব্য)।

আমিনুল ইসলাম, ১৯৯৯ (৩য় সংস্করণ); *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

আহমাদ মাযহার, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯ (নব পর্যায় পঞ্চম সংখ্যা); 'পদ্মার পলিদ্বীপ : জীবনবাস্তবতা ও ব্যক্তির সংকট', *উষালোকে* (মোহাম্মদ শাকের উল্লাহ সম্পাদিত), জনান্তিক, ঢাকা।

এস এম মনির হোসেন, অগ্রহায়ণ-ফালগুন ১৪১২ : নভেম্বর' ০৫-ফেব্রুয়ারি ' ০৬ (বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ২); 'আবু ইসহাকের গল্পের সমাজ বাস্তবতা', *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গালিব আহসান খান, ২০০১; 'জীবনানন্দ – কাব্যে অস্তিত্ববাদ প্রসঙ্গ' (সৌমিত্র শেখর; *সাহিত্যশিল্পদর্শন*, পরমা, ঢাকা) ।

নীরুকুমার চাকমা, ১৯৯৭ (পুনর্মুদ্রণ); *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোঃ শহীদুর রহমান, জুন ১৯৯৮ (পঞ্চদশ সংখ্যা); 'বাংলা সাহিত্যে অস্তিত্ববাদ' *কপুলা* (দর্শন বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)।

মোহাম্মদ নুরনবী, (সংকলন, সম্পাদন ও রচনা), ২০০৬; *অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান, ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ); *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শরীফ হারুন, ১৯৯৪ (পুনর্মুদ্রণ); *অস্তিত্ববাদ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শিরীণ আখতার, ২০০৪ (পুনর্মুদ্রণ); *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হোসনে আরা, ফেব্রুয়ারি ২০১১ (বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ১-২); 'সূর্য-দীঘল বাড়ী : অপরাজেয় জীবনালেখ্য' *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সঞ্জীব ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৮৬; *অস্তিত্ববাদ দর্শনে ও সাহিত্যে*, রত্নাবলী, কলকাতা।

Jean-Paul Sartre, 1970; *Existentialism and Humanism*, London.